দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 10 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

মেডিক্যাল শিক্ষা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, দলীয় লোক হলেই পরীক্ষায় পাস!

কবির আহমেদ খান

দুর্নীতির রাহুগ্রাস

কিডনি প্রতিস্থাপনের পূর্বাভিজ্ঞতা ছাড়াই হলেন কিডনি প্রতিস্থাপন বিষয়ক অধ্যাপক, গাইনি অনকোলজি (ক্যান্সার) ওপর ডিগ্রী-কাজের অভিজ্ঞতা নেই তিনি হয়ে গেলেন অনকোলজিস্ট। পোস্ট-গ্রাজুয়েশনে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েই পাস। ক্লাস করেননি-পরীক্ষা দিলেন, রেখে এসেছেন সাদা খাতা-অথচ ফলাফলে পাস। তিন বছরেই জুনিয়র কনসালট্যান্ট থেকে (২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

মেডিক্যালে শিক্ষা ধ্বংস

(প্রথম পাতার পর) সহকারী-সহযোগী ও সব শেষে অধ্যাপক হয়ে গেলেন। ড্যাব করেন-তাই পুরনো, অভিজ্ঞদের এড়িয়ে বিভাগের চেয়ারম্যান, মেডিক্যাল কলেজ-ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল-পরিচালক। পিএসসিতে নামকাওয়াস্তে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, অতঃপর সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক। রাজধানীতে চাকরিস্থল। রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, ভুল চিকিৎসা এবং এতে মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে। বাস্তবতা হচ্ছে চিকিৎসকদের প্রতি আস্থা দিন দিন নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে। সবই রীতিমতো বিস্ময়কর।

এসবই ঘটেছে সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও মানুষের জীবন-মরণ সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষা খাতে। ২০০১ সালের অক্টোবরে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই খাতটিতে ধ্বংসের বীজ বপন শুরু হয়। ২০০৭-এ এসে তাতে এখন পচন ধরেছে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে চারদিকে, ন্যূনতম মৌলিক অধিকারটুকু থেকেও মানুষ এভাবেই বঞ্চিত হচ্ছে। লোকবলের ভারে প্রতিষ্ঠান ন্যুব্জ, কিন্তু চিকিৎসা ও দক্ষ চিকিৎসক পাওয়া যায় না হাসপাতালগুলোতে। এসব কারণে মেধাবী ও দক্ষ চিকিৎসকরা হতাশায় ভুগছেন, তাঁদের সেবার মানও কমে যাচ্ছে।

দেশের অভিজ্ঞ ও পুরনো স্বনামধন্য শিক্ষক-চিকিৎসকদের এই নিয়ে শঙ্কার শেষ নেই। তাঁদের দৃষ্টিতে কিভাবে ধ্বংস করা হলো এই খাতটিকে— এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পাওয়া গেছে নানা লোমহর্ষক ঘটনা। শুরুটা হয়েছিল মূলত ২০০১-এ জোটের ক্ষমতায় বসার মধ্য দিয়ে। রাজধানীসহ যত্রতত্র বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিতে শুরু করল স্বাস্থ্য অধিদফতর। বর্তমানে যা দাঁড়িয়েছে ৪০-এর উর্ধে। অথচ নেই কোন ধরনের মনিটরিং। পর্যাপ্ত শিক্ষক ও ছাত্র, নিজস্ব ভবন, যন্ত্রপাতি ও হাসপাতাল না থাকার পরও বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোতে পাঠদান চলতে থাকল। ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের ডিন হয়ে বসেন ড্যাব কর্মকর্তা ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন। অর্থের বিনিময়ে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা প্রতিবছর বাড়িয়েই চলে। কোন রকমে সার্টিফিকেট নিয়ে বের হলেও এসব চিকিৎসকদের শিক্ষার মান খুবই খারাপ। সরকারী হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ইন্টার্নি করতে এদের যথাযথ সুযোগের অভাব তো রয়েছেই। ফলে বিত্তবানদের সন্তানরা 'ডাক্তার' হচ্ছেন বটে! একইভাবে অর্থের বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে চাকরি, পোস্ট-গ্রাজুয়েশনে ভর্তির দুর্নীতির সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে তাঁরা সমাজের মধ্যে ক্যান্সারের মতো বিস্তার লাভ করছেন। এঁদের কাছ থেকে জনগণ কতটুকু চিকিৎসা আশা করতে পারেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মেডিক্যাল উচ্চশিক্ষায় দেশের পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজে পোস্ট-গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী চালুর প্রথম ব্যাচেই বাছাই করা হয় দলীয় ভিত্তিতে। ২০০২-এর জুলাই মাসে দলীয়ভিত্তিতে বিএনপিদলীয় ড্যাব সমর্থক ১শ' ৬৫ জনকে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিগ্রীর জন্য নিয়োগ দিয়ে জোট সরকারের আমলে মেডিক্যাল শিক্ষাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। ওই বছর আরও একটি দলীয়করণ হয় ফেব্রুয়ারিতে। ডিএমসিতে পোস্ট-গ্রাজুয়েট কোর্সে জেনারেল সার্জারিতে এবং সলিমুল্লাহ মেডিক্যালে গাইনিতে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়নি। অথচ ফলাফলে দেখা গেল, অপেক্ষমাণ তালিকায় ২০ জনকে বাছাই করা হয়েছে। যা সকলকে অবাক করে। দলীয় লোকদের নিয়োগ দিতেই এমনটি করা হয়েছিল। একইভাবে পোস্ট-গ্রাজুয়েশন রয়েছে এমন মেডিক্যাল কলেজ, ইনস্টিটিউটগুলোতে শুধু ড্যাবের লোকদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া হয়।

বিভিন্ন সরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউটে দলীয় ও অর্থের বিনিময়ে লোক নিয়োগ দিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা হয়। যা কেন্দ্রীয়ভাবে আগে করা হতো। বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে নতুন নতুন বিভাগ খোলা হতে থাকে। শুধু দলীয় লোকদের জায়গা করে দেয়ার উদ্দেশে এসব বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। এরপরও শিক্ষকের অভাব থেকেই যায়। এ রকমভাবে ময়মনসিংহ মেডিক্যালে কার্ডিওলজি বিভাগ খোলা হয়, কিন্তু আইসিইউ নেই। চক্ষু বিভাগ খোলা হয়, অথচ দায়িত্ব দেয়া হয় একজন সহকারী অধ্যাপককে।

এভাবে দলীয় লোকদের উচ্চশিক্ষায় সুযোগ করে দিয়ে তাঁদের ডিগ্রী দিতে আবার নিয়োগ দেয়া হয় দলীয় শিক্ষক-পরীক্ষক। দলীয় লোকদের সার্টিফিকেট দিতে দলীয় পরীক্ষক পাওয়া গেলেও এক পর্যায়ে এমন দশা হয় যে, অভিজ্ঞ শিক্ষক-চিকিৎসকরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকতে এবং পরীক্ষক হিসাবে থাকতে অপারগতা প্রকাশ করতে থাকেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার এ্যাসাইনমেন্ট অফিসার ডা. ফিরোজ মাহমুদ ইকবাল, বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব তারেক রহমানের স্ত্রী, ড্যাবের মহাসচিবসহ অনেক দলীয় চিকিৎসক পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিগ্রী পেয়ে যান শুধু দলীয় ক্ষমতার জোরে।

প্রতিবছর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার টাকায় অন্তত চার শতাধিক চিকিৎসক, চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এইচপিএনএসপির আওতায় এই ট্রেনিং প্রোগ্রামে বিষয়ভিত্তিক উন্নয়নের নামে হয়েছে ভ্রমণ বিলাস। মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজন, দলীয় লোকদের ট্রেনিংয়ে নিয়ে গিয়ে রেখে আসার মতো ঘটনাও ঘটেছে। যাঁদের ট্রেনিং প্রয়োজন তাঁদের না নিয়ে দলীয়দের প্রাধান্য দেয়ায় এক্ষেত্রে চিকিৎসকদের মানের কোন উন্নতি হয়নি, দক্ষ চিকিৎসক সৃষ্টির পথে অন্তরায় তৈরি হয়েছে।

বিসিপিএস (বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এ্যান্ড সার্জনস)-এর সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব নেন বিএমএ সভাপতি অধ্যাপক এমএ হাদী, মহাসচিব হন ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন। স্বাস্থ্যখাতের শীর্ষ দুর্নীতিবাজ হিসাবে খ্যাত এই দু'ব্যক্তির হস্তক্ষেপে বিসিপিএস এ দলীয় লোকদের নিয়োগ এবং এফসিপিএস ও এমসিপিএস পরীক্ষায় ফলাফলে দলীয়দের সহযোগিতার অভিযোগ রয়েছে। লন্ডনের রয়েল কলেজের ডিগ্রী এমআরসিপি নিতে এদেশে তার সেন্টার চালুর বিষয়ে তাঁরা ঘোর বিরোধিতা করে থাকেন। বিসিপিএস এখন আলিশান বিল্ডিংয়ে অবস্থিত। চিকিৎসকদের রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান বিএমডিসির মতো প্রতিষ্ঠানকে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। একটি অথর্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন ড্যাব নেতা অধ্যাপক এমএ হাদী ও ডা. জাহিদ। যার কোন কর্মকাণ্ড নেই